ইসলামের আলোকে

পরিবার পরিকল্পনা ও মা-শিশুস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

মানব-সম্পদ উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা

পরিকল্পিত পরিবার গঠন মানব-সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম উপায়। এ দু'টি পরস্পরের পরিপূরক। পরিকল্পনা মাফিক সন্তান গ্রহণ করা হলে সকল সন্তানই হয় সুস্থ, সবল ও মেধাবী। এর ফলে সন্তানদের সুশিক্ষিত, চরিত্রবান ও আদর্শবান করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় এবং তারা তাদের যোগ্যতার বলে সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। ফলে ঐ সমস্ত সন্তান তখন মানব-সম্পদে পরিণত হয়। সুতরাং মানব-সম্পদ উন্নয়নের জন্যেই পরিবার পরিকল্পনা প্রয়োজন।

ইসলাম ও পরিবার পরিকল্পনা

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয়েই পরিকল্পিত উপায়ে কাজ করা বাঞ্ছনীয়। পরিকল্পনাবিহীন কাজ উত্তম ফলদায়ক হতে পারে না। এমন কি পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো গঠনমূলক কাজ সম্ভবই নয়। মহান আল্লাহ তায়ালা এ বিশ্বজগত এক সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার কোনোকিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি তো আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না" *(সূরা ৪৪; আয়াত: ৩৮-৩৯)*। পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, এ বিশ্বজগত তিনি খেলাচ্ছলে কিংবা অপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেননি। সবকিছু সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তায়ালার' একটি নিখুঁত পরিকল্পনা রয়েছে। অপর আয়াতে তিনি ঘোষণা করেন, "আমি সবকিছু এক সুনির্দিষ্ট পরিমাপে সৃষ্টি করেছি *(সূরা: ৫৪ আল-ক্বামার, আয়াত: ৪৯)*।

মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির পেছনে সুষ্ঠু পরিকল্পনা রয়েছে বলেই তাঁর সৃষ্টিতে কোথাও কোনো অসামঞ্জস্যতা, বিশৃঙ্খলা, অনিয়ম বা কোনোরূপ দোষত্রুটি লক্ষ্য করা যায় না। আল্লাহ তায়ালা আহকামুল হাকিমীন, তাঁর কাজের জন্যে কারো নিকট জবাবদিহি করতে হয় না। তা সত্ত্বেও তিনি এ বিশ্বজগত নির্দিষ্ট পরিমানে ও সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এ ঘোষণার মধ্যে মানব জাতির জন্য রয়েছে বিরাট শিক্ষা। আর তা হলো মানব জাতি বাস্তব জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও।" তাই মানুষের উচিত সুপরিকল্পিত জীবনযাপন করা। পরিবার গঠনের ক্ষেত্রেও মহান আল্লাহ দান করেছেন এক বিশেষ পরিকল্পনা। ইসলামে পরিবার গঠনের প্রধান এবং একমাত্র পন্থা হচ্ছে বিয়ে। বিয়ে ব্যতীত পরিবারের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সেই বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে পুরুষকে হতে হবে আর্থিকভাবে সচ্ছল। স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ ছাড়াও সন্তানের লেখাপড়া, চরিত্র গঠন, ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া পিতার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জিত না হলে দৈহিক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করে অপেক্ষা করার নির্দেশ রয়েছে পুরুষের প্রতি। মহান আল্লাহ বলেন, "যাদের বিয়ের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" *(সূরা: ২৪ আন-নূর, আয়াত: ৩৩)*।

পবিত্র কুরআন, হাদীস, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম এবং মুতাকাদ্দিমীন ও মুতাআখখেরীন উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া অনুসারে জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি অবলম্বন তথা পরিকল্পিত পরিবার গঠন জায়েয।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেক্টর প্রখ্যাত ইমাম শেখ মাহমুদ শালতুত তার 'আলফাতাওয়া' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেন-"এর প্রেক্ষিতে আলেমগণের অভিমত হলো, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্মতিতে সাময়িকভাবে গর্ভনিরোধক ব্যবহার জায়েয তো বটেই, আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত কারণে স্থায়ীভাবেও জায়েয।"

মালয়েশিয়ার জাওহার-এর মুফতি আলহাজ্জ আব্দুল জলীল এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত ফাতওয়াটি প্রদান করেন। "স্থায়ী পদ্ধতি ছাড়া ঔষধ কিংবা গর্ভনিরোধক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা জায়েয। যদি

দু'জন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দেন তাহলে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণও জায়েয।"

আল্লামা ইউসুফ আল-কারদাবী বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম। সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ মনীষীর গ্রহণযোগ্য একটি বিখ্যাত কিতাব "আল্ হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম" (পৃ. ২৬০-২৬৫) থেকে আলোচ্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ জায়েয, যেমন-

প্রথমত, মায়ের জীবন বা স্বাস্থ্যের ওপর যদি রোগ বা প্রসবকালীন সংকটের দরুন হুমকি দেখা দেয়, তাহলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সংকট বা হুমকির কথা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জানা যাবে, কিংবা কোনো বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাবিদ তা বলে দেবেন। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন: "তোমরা নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না" *(সুরা: ২, আয়াত: ১৯৫)*। অন্যত্র তিনি বলেছেন - "তোমরা নিজেরাই নিজেদের হত্যা করো না। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতি অতীব দয়াবান" *(সুরা: ৪ আন-নিসা, আয়াত: ২৯)*।

দ্বিতীয়, বৈষয়িক অসুবিধা, সমস্যা ও অনিশ্চয়তা-অসহায়ত্বের মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা; যার দরুন দীনি সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হবে। যার ফলে মানুষ সন্তানাদির কারণে হারাম জিনিস গ্রহণ ও অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার পরিণতি দেখা দেবে। আল্লাহ্ বলেছেন, "আল্লাহ্ তোমাদের সহজ সচ্ছলতা কামনা করেন এবং তিনি কষ্ট ও কাঠিন্য কামনা করেন না" *(সুরা: ২ বাকারা, আয়াত: ১৮৫)*। "আল্লাহ্ তোমাদের ওপর সংকীর্ণতা বা অসুবিধা চাপিয়ে দিতে চান না" *(সুরা: ৫ আল-মায়িদা, আয়াত : ৬)*।

তৃতীয়, সন্তানদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া কিংবা তাদের সঠিক লালন-পালনের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে আরও একটি প্রয়োজনের উল্লেখ করা যায় তা হচ্ছে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের আবার গর্ভসঞ্চার হলে শিশুর পক্ষে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তখন মায়ের দুধের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং ফলে শিশু দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। নবী করীম (সা.) উম্মতের জন্যে সামষ্টিকভাবে কল্যাণকর কার্যাদি করার হিদায়াত দিতেন। আর যেসব কাজের ফলে উম্মতের ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশংকা করতেন, তা পরিহার করে চলতে বলতেন। আধুনিককালের গর্ভ বন্ধকরণে যেসব নব উপায় বা পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে তা প্রয়োগ ও ব্যবহার করে কল্যাণের দিকটার সংরক্ষণ সম্ভব। আর রাসূলে করীম (সা.) তা-ই চেয়েছিলেন। অর্থাৎ দুগ্ধপায়ী শিশুকে ক্ষতি থেকে বাঁচানো। নবী করীম (সা.) নারীদের অধিকারের ওপর সে সময়ই এতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যখন দুনিয়ার মানুষ নারীর অধিকার বলতে কোনো কিছুর সাথে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল। এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, পরিবার পরিকল্পনা ইসলামী শরীয়তে জায়েয।

আযল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সময়কালে প্রচলিত গর্ভনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। স্ত্রীর সাথে মিলনকালে গর্ভাশয়ে বীর্যপাত না করে বাইরে ফেলার নামই আযল। আজকের বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার যুগে আযলের উন্নত রূপই হচ্ছে বর্তমান পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি। যেখানে নানাবিধ উপকরণের মাধ্যমে আযলের ন্যায় কার্যই সম্পাদন করা হয়।

রাসূলে করীম (সা.) এর যুগে পাথর, গাছের ছাল, চামড়া, হাড় ইত্যাদিতে লেখা হত। বর্তমানে লেখার জন্য ব্যবহার করা হয় উন্নত কাগজ। যেটাকে কেউ নাজায়েয মনে করে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর যুগে যাতায়াতের সাধারণ বাহন ছিল উট, গাধা, ঘোড়া। বর্তমানে আধুনিক দ্রুতগামী যানবাহন, বিমান ইত্যাদি এগুলোর স্থান গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সবাই এটাকে স্বাগত জানিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে যেহেতু উন্নত প্রযুক্তি ও উপকরণের ব্যবহার হচ্ছে সেহেতু জন্মনিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে আযলের উন্নত রূপ আধুনিক গর্ভনিরোধ পদ্ধতিও যথার্থ।

পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে অঙ্গহানি করা হয় যা ইসলামে বৈধ নয়- এ বিষয়ে ব্যাখ্যা

স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতিতে আসলে কোনো অঙ্গহানি করা হয় না। কেবলমাত্র স্থায়ী পদ্ধতির ক্ষেত্রে শুক্র বা ডিম্ববাহী নালীকে বেঁধে কেটে দেওয়া হয়; যা পরবর্তীতে প্রয়োজনে খুলে দেওয়া যায় এবং কাটা থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে তা জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। কারও যদি এপেন্ডিসাইটিস হয় তাহলে অন্ত্রনালীর শেষাংশে একটি বাড়তি অংশ 'এপেন্ডিক্স' কেটে ফেলা হয়। এতে কোনো ক্ষতি হয় না। এই অপারেশনকে কেউ নাজায়েয বলেনি। এছাড়া একজনের একটি কিডনি অন্যকে দান করা জায়েয রাখা হয়েছে, একটি চোখ অন্যকে দান করা সাদাকাহ হবে বলে আন্তর্জাতিক ফিকাহ একাডেমি ফাতওয়া প্রদান করেছে।

কোনো একটি দাঁত ব্যাথা করলে ডাক্তারের পরামর্শে তা উপড়ে ফেলা হয়। তাকেও কেউ অঙ্গহানি বলে না। প্রয়োজনের তাগিদে অল্প ক্ষতি মেনে নিয়ে বহুতর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা ইসলামের নির্দেশনা। জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, টিউবেকটমি ও ভ্যাসেকটমির মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে যে আপাতঃ বন্ধ্যাকরণ করা হয় তার হার খুবই কম এবং তাও উপকারভোগী নারী ও পুরুষের সম্মতিতে তাদের বৃহত্তর স্বার্থে করা হয়।

বর্তমানে যে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা বিশেষ প্রয়োজনে আবার পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এদিক থেকে এটি সম্পূর্ণরূপে স্থায়ী পদ্ধতি বা অঙ্গহানী নয়। বিশেষ প্রয়োজনে অঙ্গের কার্যকারিতা বন্ধ রাখা এমনকি স্থানান্তর ইসলামী শরীয়ায় বৈধ রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের ওপর তোমাদের দ্বীনে কোনো বিব্রতকর বা ক্ষতিকর বিষয় রাখেননি" *(সুরা: ২২, আয়াত: ৭৮)*। অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন: "তোমরা পরস্পরকে পুণ্য ও সংযমের কাজে সহযোগিতা করো, গুনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না" *(সুরা : ৫, আয়াত : ২)*।

ইসলামের আলোকে বিয়ের বয়স

ভবিষ্যতে সন্তানের মা যিনি হবেন তাকে অবশ্যই পরিপক্ক হতে হবে। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে ইসলামে নারী বা পুরুষকে বালেগ বা পরিপক্ক হওয়া অত্যাবশ্যকীয় বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। পরিপক্কতা শুধু বয়স ধরে নিলেই চলবে না। বয়সের পরিপক্কতা ছাড়াও ভবিষ্যৎ মায়ের শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও মানসিক পরিপক্কতার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা দুটি ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে লালিত-পালিত মানুষ যখন দাম্পত্য জীবন রচনার মাধ্যমে একে অন্যের সাথে অভিন্ন অংশীদার হয়ে বসবাস করবে তার আগে তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পরিপক্কতা একান্ত দরকার। অনেক জায়গায় এখনও খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। অল্প বয়সে শরীর ও মনের পরিপক্কতা যেমন আসে না তেমনি জ্ঞানের পরিপূর্ণতাও লাভ হয় না। যথেষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও একটি মানুষের মধ্যে জ্ঞান, মননশীলতার দিক থেকে পরিপক্কতা অর্জিত হতে পারে। তবে এই পরিপক্কতার জন্যে বয়সের পরিপূর্ণতার দরকার এবং সচেতনতা ও পরিচর্যার প্রয়োজন। অল্প বয়সে বিয়ের পর দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করলে অনেক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের স্বাস্থ্যহানিও ঘটে।

বিয়ের জন্য আদর্শ বয়স কী ? এই বিষয়ে আলোচনার আগে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এর দিকে তাকালেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। নবী করীম (সা.) বিয়ে করেন ২৫ বছর বয়সে এবং যাকে বিয়ে করেন তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা (রা.) এবং তিনি ছিলেন সর্ব বিষয়ে পরিপক্ক মহিলা। আমাদের জন্যে রাসূলে পাকের আদর্শই উত্তম আদর্শ। তিনি নিজে যেমন পরিণত বয়সে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেন তেমনি নবী নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা.) কেও পরিণত বয়সের আগে বিয়ে দেননি।

সন্তানের ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কোমল ব্যবহার পিতা-মাতার প্রাপ্য। বিশেষ করে সন্তানের ভালোবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা মাতা পাওয়ার বেশী অধিকারী। একজন মায়ের গর্ভকালীন কষ্টের কথা আল্লাহ তায়ালা এভাবে ব্যক্ত করেন, "আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার ব্যাপারে এই উপদেশ দিয়েছি যে, তার মা তাকে কষ্টের ওপর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং তোমার মাতা পিতার প্রতিও। আমারই কাছে তোমাদের শেষ গন্তব্য" *(সূরা: ৩১, আয়াত: ১৪)।*

রাতে বিছানায় শিশু অনেক সময় প্রস্রাব-পায়খানা করে দেয়। মা গভীর রাতে উঠে কত কষ্ট করে পরিষ্কার করে এবং শিশুকে মায়ের পরিষ্কার জায়গায় শুইয়ে দেয়, নিজে সেই ভেজা জায়গায় শুয়ে থাকে। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়। শিশুর প্রতিটি ব্যাপারে মায়ের খেয়াল রাখতে হয়, সতর্ক থাকতে হয়। তাই সেই মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি।

নিচের হাদীস পর্যালোচনা করলে মায়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। "এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, কে সবচেয়ে বেশি আমার সাহচর্য ও সেবা পাওয়ার অধিকারী? রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? রাসূল (সা.) পুনরায় বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি তৃতীয় বার জিজ্ঞেসা করলেন, তারপর আমার সাহচর্য এবং খেদমতের অধিকারী কে? রাসূল (সা.) পুনরায় বললেন, 'তোমার মা'। তারপর সাহাবী পুনরায় জিজ্ঞেসা করলেন, তারপর কে ? রাসূল (সা.) বললেন, 'তোমার বাবা' (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)।

ইসলামের আলোকে মাতৃস্বাস্থ্য ও নিরাপদ মাতৃত্ব

ইসলামে মায়ের মর্যাদা অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। মহানবী (সা.) বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশ্‌ত। পারিবারিক জীবনে সন্তানের মা সকল সদস্যের কাছ থেকে সম্মানজনক ও সদাচরণ পাওয়ার দাবীদার। পুরুষ ও নারীর শরীরের গঠন ও কাঠামোগত পার্থক্য থাকলেও নারীর দেহের পরিমাপ ও উচ্চতার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ক্যালরি অবশ্যই দরকার। সাধারণত আমাদের সমাজে স্বামী বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খাবার পরিবেশনের পর স্ত্রী নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য রাখেন না। এই ব্যাপারে স্বামীর নজর রাখা কর্তব্য যাতে স্ত্রী বা সন্তানের মা প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে যত্নবান হন। বিশেষ করে গর্ভকালীন সময়ে এবং বাচ্চাকে দুধ পান বা দুধ দানকালে এই ব্যাপারে বেশী দৃষ্টি রাখা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন - "আর সন্তানের পিতার দায়িত্ব যথাবিধি তাদের (মায়ের) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা" *(সূরা : ২ আল-বাকারা, আয়াত : ২৩৩)।*

গর্ভবতী মায়ের যত্ন ও সেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্তান যে মুহূর্তে মায়ের গর্ভে আসে ঠিক তখন থেকেই সন্তানের যত্ন শুরুর পাশাপাশি মায়ের যত্ন নিতে হবে।

গর্ভবতী মায়ের যত্ন মূলত সন্তানের যত্ন। সন্তান গর্ভে আসলে মা সাবধানে জীবনযাপন করবেন। তা না হলে মা ও সন্তান উভয়েরই সমূহ বিপদ হতে পারে। গর্ভবতী মাকে অবশ্যই 'তাকওয়া' অবলম্বন করতে হবে। তাকে সর্বপ্রকার খারাপ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। সন্তান গর্ভে আসলে মায়ের শরীরে প্রচুর পুষ্টির দরকার হয়। এই সময়ে মা ও গর্ভস্থ শিশু দু'জনেরই খাদ্য প্রয়োজন। তাই গর্ভবতী মাকে বেশি করে খাবার খেতে হবে। পবিত্র কোরআনে নির্দেশ এসেছে : "আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক থেকে তোমরা উত্তম খাবার খাও" *(সূরা: ৫, আয়াত: ৮৮)।*

পুষ্টিকর ও সুষম খাবারই উত্তম খাবার। এখনও আমাদের দেশে গর্ভবতী মাকে অনেক সময় অজ্ঞতার কারণে কম খাবার খেতে বলা হয়। তাদের ধারণা, মা বেশি খেলে পেটের সন্তান বড় হবে এবং প্রসবে কষ্ট হবে। এটা শুধু ভুল নয়, বরং অপরাধ। গর্ভবতী মা বেশি করে খাবার না খেলে তার স্বাস্থ্য যেমন ভালো থাকবে না তেমনি সন্তানও সুস্থ হবে না। গর্ভবতী মা কম খাবার খেলে সন্তান শুধু রোগাই হবে না, তার মস্তিষ্কও দুর্বল এবং খাটো হবে। সন্তান জন্ম নেওয়ার পর যদি তাকে যথেষ্ট পরিমাণে খাবার দেওয়া না হয় তবে মায়ের গর্ভকালীন যে দুর্বলতা তা আর পূরণ হবে না।

গর্ভবতী মাকে ভাত, মাছ, ডাল, রুটি ইত্যাদি যেমন বেশি করে খেতে দিতে হবে, তেমনি শাক-সবজি, তরিতরকারীও প্রচুর খেতে হবে। তাছাড়া প্রতিদিন তাকে কোনো না কোনো ফলও খেতে হবে। গর্ভবতী মায়ের জন্যে বেশি করে ফুটানো বা টিউবওয়েলের পানি পান করা প্রয়োজন।

গর্ভবতী মায়ের জন্য ভারী বোঝা বহন করা নিষেধ। তাকে মানসিকভাবে উৎফুল্ল রাখতে হবে। কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ তাকে বিপর্যস্ত করলে গর্ভের সন্তানের ওপর এর প্রভাব পড়বে। গর্ভবতী মায়ের শারীরিক অসুবিধা বা রক্তশূন্যতা দেখা দিলে, চোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলে বা শরীর দুর্বল মনে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে হবে। গর্ভবতী স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে অধিক খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া শাশুড়ী এবং অন্যান্য নিকটজন সবাই তাকে যত্ন করবেন এবং আনন্দে রাখবেন। এ ব্যাপারে মহিলা আপনজন যারা, তাদের ভূমিকা বেশি। কারণ গর্ভবতী মা তাদেরই মতো একজন নারী। গর্ভের ৪র্থ মাস হতে গর্ভবতী মাকে চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হবে এবং মাঝে মাঝে অবশ্যই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। এ সময় তাকে ধনুষ্টংকার রোধের জন্যে এক মাস পর পর দুটি টিটি ইনজেকশন নিতে হবে। এর দ্বারা মা ও শিশু দু'জনই ধনুষ্টংকার রোগ থেকে আল্লাহর রহমতে রক্ষা পাবে। গর্ভবস্থায় পাঁচ থেকে আট মাসের মধ্যে ইনজেকশন না নিলে মা ও শিশু উভয়েরই ধনুষ্টংকার রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার ফলে মৃত্যুও হতে পারে। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসেও শিশুর যত্নের ব্যাপারে বিভিন্ন শিক্ষা ও নির্দেশনা রয়েছে যা চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে, তা পালন করা অত্যন্ত জরুরি।

ইসলামের আলোকে নবজাতকের যত্ন ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা

ক) সন্তান গ্রহণ এবং প্রতিপালন-

সন্তান স্বামী-স্ত্রীর জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। সন্তান দাম্পত্য জীবনের কেবল সেতুবন্ধনই নয়, দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তার ও উপায়। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অত্যন্ত বিচার-বিবেচনা করে ঠিক করবেন তারা কখন এবং কতজন সন্তান গ্রহণ করবেন। কেননা সন্তান জন্ম দিলে পরে তাদের যত্নসহকারে লালন-পালন ও শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা পিতা-মাতার জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা করলে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

খ) সন্তানের যত্ন শুরু করার সময়-

সন্তান যে মুহূর্তে মায়ের গর্ভে আসে ঠিক তখন থেকেই সন্তানের যত্ন শুরু করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গর্ভবতী মায়ের যত্ন মূলতঃ সন্তানের যত্ন। সন্তান গর্ভে আসলে মাকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। তা না হলে মা ও সন্তান উভয়েরই সমূহ বিপদ হতে পারে। গর্ভবতী মাকে অবশ্য 'তাকওয়া' অবলম্বন করতে হবে। তাকে সর্বপ্রকার খারাপ আচরণ ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এসময় গর্ভবতী মাকে পরিমিত সুষম খাবার দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ) প্রসবকালীন সাবধানতা-

ইসলামে সন্তান প্রসবকালীন সময়ে পবিত্রতা ও সাবধানতা অবলম্বনের ব্যাপারে বহু নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্রতা ও সাবধানতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ তায়ালা কোনো কোনো নবী-রাসূলের জন্মের সময়ে ফেরেস্তা পাঠিয়েছেন। এ জন্যে যে, প্রসবকালীন সময়ে অত্যন্ত সাবধানতা, পবিত্রতা

ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হয়। বর্তমান কালে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রায় সবত্রই গড়ে উঠেছে। যাদের পক্ষে সম্ভব হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সন্তান প্রসবের ব্যবস্থা করা উত্তম। এটা সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও প্রসব সময়ে একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী বা পরিবার পরিকল্পনা কর্মী অথবা দাই-এর সাহায্য নেওয়া অবশ্যই দরকার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোভাবে রক্ষা করা দরকার। এজন্যে হাত বিশুদ্ধ পানিতে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তোয়ালে, গামছা পূর্বেই সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে রাখতে হবে। প্রসব করানোর জন্যে ব্লেড ও নাড়ী বাঁধার সুতা ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করে ব্যবহার করতে হবে। সাবধান! শিশুর নাড়ীতে গোবর, ছাই বা মলম ইত্যাদি কখনও লাগাবেন না। এসব থেকে ধনুষ্টংকার ও অন্যান্য রোগের সংক্রমণ হয়। মহানবী (সা.) বলেছেন: "পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক" *(মিশকাত)*।

শিশুকে মায়ের বুকের দুধ দেওয়ার ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশ

জন্মের পর পরই শিশুকে মায়ের শাল দুধ দিতে হয়। অনেক সময় মায়ের বুকের হলুদ রং -এর দুধ (শাল দুধ) ফেলে দেওয়া হয়। এটা খুব ভুল কাজ। আল্লাহ তায়ালা নিজেই মায়ের বুকে এই দুধ জমা করেছেন। এই দুধ শিশুর জন্যে খুবই উপকারী। শাল দুধ শিশুকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে। প্রথম কয়েক দিনের দুধ শিশুর জন্যে খুবই উপকারী। সন্তান মায়ের বুকের দুধ পান করার পূর্ণ অধিকার রাখে। দুধ পান ও দুধ দানের মাধ্যমে মা ও সন্তানের মধ্যে বেহেশতি ভালোবাসার অটুট বন্ধন তৈরি হয়। এতে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। মা বাচ্চাকে বুকের দুধ দান করলে সহজে পুনরায় গর্ভে সন্তান আসে না। সন্তানকে বুকের দুধ পান করালে মায়ের সৌন্দর্য লোপ পায় বা নষ্ট হয়ে যায়, এই ভুল ধারণাবশত অনেকে সন্তানকে বুকের দুধ দেন না। এটা মারাত্মক ভুল এবং গুনাহর কাজ। মূলত সন্তানকে দুধ দান করলে মায়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তবে এ ব্যাপারে মাকে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়।

কোরআন পাকে মায়েদের প্রতি নির্দেশ এসেছে যে, তারা যেন সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর বুকের দুধ পান করান। "মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানকাল পূর্ণ করতে চায়" *(সূরা: ২ আল-বাকারা, আয়াত: ২৩৩)*। যদি কোনো মা তার বাচ্চাকে দু'বছর দুধ পান করাতে চান তবে এই সময়ে তাঁর নতুন করে গর্ভধারণ না করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ গর্ভধারণ করলে স্বাভাবিকভাবেই বুকের দুধ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই কোলের শিশু দুধ পান করলে মা পুনরায় গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকবেন।

শিশুকে দুধদান কালে মায়ের শরীরের যত্ন নেওয়া খুব প্রয়োজন। মাকে এই সময়ে পর্যাপ্ত খাবার খেতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, মায়ের দুধের বিকল্প নেই। ইসলাম গোড়াতেই এই বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, মায়ের স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে আর মা যদি তার বাচ্চাকে নিয়মিত বুকের দুধ পান করান তবে সাধারণত সন্তান দুধ পানকালীন সময়ে মা আর গর্ভধারণ করেন না। আর এতে করে মায়ের স্বাস্থ্য অটুট থাকে এবং তার বাচ্চা প্রসবকালীন ক্ষয় পূরণ হয়। মা সন্তান প্রসবের পর মায়ের শরীরে যে ক্ষয় হয় তা পূরণ হতে কমপক্ষে আড়াই বছর সময় লাগে বলে চিকিৎসকদের অভিমত।

ছয় মাস বয়স থেকে শিশুকে মায়ের দুধ ছাড়াও নরম খাদ্য খাওয়ানো শুরু করতে হবে। যদি মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ না থাকে তবে ছয় মাসের আগেই দুধের বিকল্প খাবার দিতে হবে। সুজি বা চালের গুড়া, চিনি বা গুড় দিয়ে দুধের সাথে গরম করে খাওয়ানো যেতে পারে। তাছাড়া সবজি প্রভৃতি ভালো করে সিদ্ধ করে এবং নরম ফল-ফলাদিও খাওয়ানো দরকার। শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকবে তার খাবারের পরিমাণ এবং আইটেমও বাড়াতে হবে। শিশুকে বিভিন্ন রকম ও বিভিন্ন স্বাদের খাবার ও ফল-ফলাদি খাওয়ালে শিশুর মধ্যে রুচি আসে। তার দেহের বিভিন্ন রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। অনেক মাকে দেখা যায়, শিশুর জন্যে খাবারের আইটেম বাড়ান না। ফলে শিশুর অরুচি আসে, শিশু খেতে চায় না। অপরদিকে শিশুর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। ফলে শিশু-বয়সেই বিভিন্ন রোগ দেখা দেয়। তাই মাকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা না করে শিশুকে কেবলমাত্র ঝাড়ফুঁক, লতাপাতার ভুল চিকিৎসা দিলে অনেক সময় শিশুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। কাজেই শিশুর যে কোনো সমস্যায় নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কারণ দু'আ হিসেবে ঝাড়ফুঁক ইসলামে স্বীকৃত হলেও পাশাপাশি মহানবী (সা.) ঔষধ ব্যবহারের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিশুর সুচিকিৎসা ও মানসিক বিকাশ

প্রতিটি শিশুকে টিকা দিতে হবে। শিশুকে স্বাস্থ্যকর্মী বা পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর কাছে নিয়ে গিয়ে তাকে ইপিআই টিকা ও ইনজেকশন দেওয়াতে হবে। শিশুর দেড় মাস বয়স থেকেই এই টিকা দান শুরু করতে হয়। এই টিকা নিলে শিশুর হুপিং কাশি, ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টংকার, পোলিও, হাম ও যক্ষা রোগ আর না হওয়ারই কথা। টিকা হলো মারাত্মক ব্যাধি থেকে রক্ষার উপায়। তা গ্রহণ না করা যেন নিজেকে আত্মহননে ঠেলে দেওয়া। যে বাবা-মা তাদের বাচ্চাকে এই টিকা দিতে পারলো না তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করল না। আর এর ফলে ভোগান্তির শিকার হতে হয় সেই শিশুকেই। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের সবার দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ব পালনে আমাদের সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার শরীরের ওজনও নিয়ম মাফিক এবং আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। শরীরের ওজন ঠিকমত বাড়ছে কিনা তা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বুদ্ধিদীপ্ত শিশু সকলেরই কাম্য। এজন্য জন্মের পর হতে শিশুকে পারস্পরিক ক্রিয়ামূলক যত্ন দিতে হবে; যাতে শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয় কাজ করে। যেমন; তার সাথে হাসি দিয়ে কথা বলা, রঙিন বস্তু দেখানো এবং সহায়ক ও নিরাপদ পরিবেশে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা।

পরিবারে ঝগড়াঝাটি করলে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। এজন্য পরিবারের সকলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেন। শিশুর নিরাপত্তার জন্য ছুরি, দা, দিয়াশলাই ইত্যাদি কোন বিপজ্জনক বস্তু শিশুর নাগালের বাইরে রাখা উচিৎ।

ইসলাম নবজাতক শিশুর যত্ন সম্পর্কে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছে, তা এক কথায় অপূর্ব ও অতুলনীয়। ইসলামের দিক-নির্দেশনা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যা নবজাতক শিশুর প্রতিটি ক্ষেত্রে উপকার নিশ্চিত করবে। উপরোক্ত ইসলামী নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে একটি শিশুর যত্ন নেওয়া হলে সে পরিপূর্ণ মানবরূপে বিকশিত হবে ইন্‌শা-আল্লাহ্।

সূত্র: ইসলামের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা,
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

ছেলে হোক, মেয়ে হোক
দু'টি সন্তানই যথেষ্ট